প্রসঙ্গ : যব খেত জাগে

কৃষণ চন্দব

আমি যদিও কৃষক নই, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে থাকার সুযোগ আমার জীবনে অনেক ঘটেছে। আমার শৈশব এবং কৈশোর কৃষকদের মধ্যেই কেটেছে। কৃষকদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে জড়িত যে-সব কাজ— যেমন হাল চালানো, নিড়াই করা ধান বোনা, ফসল তোলা এসব তাদের কাছ থেকেই আমি জেনেছি। খেতে-খামারে যারা কাজ করে, তাদের প্রতি যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা আমাকে ভারতীয় কৃষকরাই শিখিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি যে ভালোবাসা এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে থাকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার যে বাসনা আমার অধিকাংশ গল্পে আপনারা পেয়েছেন, তা আমি কৃষকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের সঙ্গে থাকার জন্যেই, তাদের ওপর যে সমস্ত অত্যাচার চলে, তা আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। আর বর্তমান জীবন-ব্যবস্থা পুরোনো জীবন - ব্যবস্থার সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে যেন তাদের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে আছে। একেক সময় মনে হয়, আমি নিজেই তাদের ঘাড়ের ওপর এই জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছি। কারণ গ্রামের যে শাসকশ্রেণী, সেই শাসক শ্রেণিরই আমি একজন সন্তান। আমার মনে হয়, বর্তমানে যা কিছু ঘটে চলেছে, এর জন্যে আমার বাবা-ই দায়ী। দায়ী আমার বাবার বন্ধুরা এবং তাদের বন্ধুরা। তাদের বাড়ির দরজা আমার জন্যে ছিল সর্বদাই উন্মুক্ত। কিন্তু আমাকে থাকতে হত আমার উচ্চবর্গ বাবার কাছে। সেই জন্যেই কৃষকদের জীবনকে আমি দু-দিকের দুটি দরজা দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। , তার কারণ আমি তাদের জীবন দেখতে চেয়েছিলাম। আর দেখতে বাধ্য ও হয়েছি।

শোষণের এই যে ধারা, তার শুরু হয় এক দরজা থেকে আর শেষ হয় গিয়ে আর এক দরজায়। আর আমি এই শোষণের ধারার শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত চোখে মেলে দেখতাম। সে সময় যে-জিনিসটা আমি বুঝতে পারতাম না, তা হচ্ছে নৈতিকতার দুটি সাম্প্রতিক রূপ, যার একটি সৃষ্টি করেছে অভিজাত বর্গ আর অন্যটি কৃষকরা। অভিজাতদের দামী এবং ভালো কাপড়-জামার প্রয়োজন, আর কৃষকদের এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভালো জামাকাপড় পরলে তারা মর্যাদাশীল হয়ে উঠবে। আমাদের বাড়িতে এবং অন্যান্য অভিজাতবর্গের বাড়িতে প্রতিটি মানুষ দিনে দু-তিনবার ভরা-পেট আহার করত, কিন্তু কৃষকরা যদি দিনে দু-তিনবার আহার করত, তাতে তা অন্যায় - বেআদপী বলে মনে করা হত। কারণ তাতে তাদের স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে এবং সেবা করার যে মনোবৃত্তি তা আর থাকবে না। কেউ শ্রম দিলে, সেই শ্রমের বিনিময়ে তার মজুরী পাওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু আমরা তাদের বেগার খাটিয়ে নিতাম।

আমাদের অভিজাতবর্গের ঘরে মা- বোনের ইজ্জত আছে। তাদের খুব সম্মান করা হয়। আমাদের এলাকার তহসিলদার হিন্দু। হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীকে পর্দানশীল করে রেখেছিল। কিন্তু কৃষকদের মা বোন এবং স্ত্রীদের বেইজ্জত করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি আমার কিশোর বয়সে একজন রাজা সাহাবকে দেখেছি। সে যখন তার জমিদারি পরিদর্শনে বের হত, এবং যে-সব গ্রামে যেত, সেই সব গ্রামের কিসান আর তাদের মেয়ে বউ এবং শিশুদের বেঁধে আনত। পুরুষ আর মেয়েদের পৃথক পৃথক সারিতে দাঁড় করাত। পুরুষদের জুতো দিয়ে পেটাত, আর মেয়েদের পাঠিয়ে দিতো সারা রাতের জন্যে তার কর্মচারীদের তাঁবুতে। এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছি— একবার নয় অজস্রবার। আর না জানি এ দৃশ্য কল্পনায় কতবার প্রত্যক্ষ করেছি।

এসব আমার শৈশবের ঘটনা। আমার এক কংগ্রেসী বন্ধু বলেন, চণ্ডিগড় ছাড়িয়ে সিমলা যাওয়ার পথে আজও এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে জলের প্রচন্ড অভাব। এখানে দেহাতি মেয়েদের জলের জন্যে জঙ্গলের ঝরণায় যেতে হয়। আর এই জঙ্গল এক পাহাড়ি ঘাঁটির ওপর অবস্থিত। এই পাহাড় আর জঙ্গলের ভার যাঁর ওপর আছে তিনি একজন বিরাট উচ্চপদস্থ অফিসার। তাই ঝরণার জলে তেষ্টা মেটানোর জন্যে মেয়েদের উপঢৌকন দিতে হয় তাদের সতীত্ব— তাদের ইজ্জত। আর এই উচ্চপদস্থ অফিসার হচ্ছেড় একজন কংগ্রেসী পত্রিকার এডিটরও। তাঁর পত্রিকাতেই এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনা মনে হয়, কৃষকদের ওপর যে অত্যাচার চলে আসছে, তা এতটুকু কম হয়নি। আর কৃষকদের এই যে সমস্যা, সেই সমস্যা সারা ভারতবর্ষে কমবেশি একই রকম। যুগ যুগ ধরে তাদের ওপর চলছে অত্যাচার। আমাদের কৃষকদের ওপর যারা অত্যাচার চালিয়ে আসছে তাদের সঙ্গে কৃষকদের ঘনিষ্ঠতা খুবই কম। এই অত্যাচারীদের তারা জীবনভর ঘৃণা করে। কারণ যারা তাদের ওপর অত্যাচার করে আসছে, আগেও তাদের হৃদয় ছিল মূক, —আজও তেমনি দয়া-মায়াহীন। তাই তাদের যখন বলা হয়, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে গিয়েছে, এখন ফুর্তি কর, তখন কিন্তু তাদের চোখ আনন্দ আর খুশিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে না। স্বাধীনতার যে আবেগ, সেই আবেগ তো আপনার থেকেই সৃষ্টি হয়।

কৃষকদের ওপর এই যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের রূপ এক গভীরভাবে প্রোথিত দৃঢ় এবং সংগঠিত যে, এর শিকড়মূল হাজার হাজার বছর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত। যাঁরা শহরে থাকেন, তাঁরাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে আনন্দের সঙ্গেই সমর্থন করেন। নৈতিকতা সম্পর্কে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তা শহরেও অগোচর নয়। এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা এই অত্যাচারকে অন্যায় বলে মনে করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কৃষকদেরও দোষারোপ করেন। তাঁদের ধারণা কৃষকরা মূর্খ বেকুব পশু এবং নিষ্কর্মা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এবং জাগরণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই — নেই বলে তাদের এরকম ব্যবহার করা হয়। কারা তাদের মূর্খ করে রেখেছে, কারা তাদের বোকা আর বেকুব বানিয়ে রেখেছে, কারা তাদের সভ্যতার সমস্ত অগ্রগতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে? এসবের অনুসন্ধান করার সাহস তাঁদের মোটেই নেই।

যদি আমরা সত্যি সত্যি আমাদের জীবন এবং সমাজকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর করতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের এসব কারণের অনুসন্ধান করার জন্যে সাহসী হতে হবে। অত্যাচারের সেইসব রূপকেও দেখতে হবে, —যা দু-এক বছর থেকে নয়, যুগ

যুগ ধরে কৃষকদের ওপর চলে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে দেখতে চাই না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে কোনরকম সৃজনশীল ভূমিকা নিই না, কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কোনরকম মদতও দিই না। কিন্তু কৃষকরা যখন চারিদিক থেকে তাদের ওপর সংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেরাই উপায়হীন ভাবে নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে, — নিজেদের জমি ভিটেমাটি মা-বোন এবং স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে উঠে দাঁড়ায় এবং যখন এই অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে পথ খুঁজে বের করে, তখন তাদের ওপর জুলুম কায়েম রাখার জন্যে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিই পুলিশ আর মিলিটারি। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করে দিই তাদের ঘর-বাড়ি আর ফসল। আর তাদের ওপরই দোষারোপ দিই, তারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ করছে। যারা গুলি করছে আর গ্যাস ছড়াচ্ছে, দিনরাত বল আর হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, পুলিশ আর ফৌজ পাঠাচ্ছে, তাদের মুখ থেকে এই দোষারোপ মোটেই শোভা পায় না।

'যব খেত জাগে' - তে কৃষকদের এই নতুন আন্দোলনকে আমি কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছি— যে আন্দোলন অন্ধ্রের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছে। এর আগেও কৃষকরা নিজেদের অধিকারের জন্যে লড়াই করেছে, কিন্তু সেই লড়াই-এ তারা শহরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্কে তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু এবার অন্ধ্রের এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, তা শহরের বড়ো কারণ এবার সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী অংশ শ্রমিক শ্রেণি এই আন্দোলনের ওপর স্থাপন করেছে তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্ব। তাই তেলেঙ্গানার এই মোর্চা আজ সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের সমস্যা তার নিজস্ব তীব্র গতিময়তা এবং নির্ভীকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই সমস্যা এমন তীব্রতা ও সত্যতা সামনে তুলে ধরেছে যে, বন্ধু এবং শত্রু —উভয়কেই স্বীকার করতে হচ্ছে, কৃষকরাই সঠিক। তাদের জমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিছু কিছু মানুষ এই আন্দোলনকে রাজনীতির আবরণে ঢাকতে চাইছে। তারা জমির বদলে দশগুণ ক্ষতিপূরণের কথা বলছে— যে ক্ষতিপুরণ ভারতবর্ষের গরিব কৃষকরা দশ পুরুষ ধরেও আদায় করতে পারবে না। অন্যদিকে শ্রীবিনোবা ভাবে চালাচ্ছেন ভূদান আন্দোলন। তিনি বলছেন, কৃষকদের জমি দান কর। দানের মাধ্যমে যদি কৃষক এবং গরীবদের সমস্যার সমাধান হত, তবে তা এতদিনে সমাধান নিশ্চয়ই হয়ে যেত। দানের নিয়ম হচ্ছে, একজন ততটুকুই দান করবে, যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু যখনই দানের অংশে নিজের প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই সে হাত গুটিয়ে নেবে।

'যব খেত জাগে' —বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ কৃষকদের কাহিনী —যে-কৃষকরা তাদের জমির ওপর অধিকার রক্ষার জন্যে অত্যাচারীর হিংসার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ কাহিনি কৃষকদের নিয়ে লেখা, যারা স্বয়ং মেহনত করবে। তাই শহরের শ্রমরত শ্রমিকশ্রেণির মদত এবং নেতৃত্বকে তারা খারাপ চোখে দেখেনি। শহর এবং গ্রামের যে ফারাক এবং বিদ্বেষ অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে দেখা যায়, তার লেশ মাত্র তাদের মধ্যে ছিল না।

এই কৃষক জাগ্রত এবং সংগঠিত। তারা শুধু হাল চালাতেই চায় না, বই পড়তে এবং প্রেম করতেও চায়। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে খাজাঞ্চিখানা, সেই খাজাঞ্চিখানার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিতও হতে চায়। তারা অন্যের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে চায় না। তাদের বক্তব্য, এই জমির মালিক তো আমরা আজ থেকে নই। আমরা এই জমিতে শ্রম দিয়েছি—ফল ও ফুলে তা মঞ্জরিত করে তুলেছি। এই শ্রমের জন্যেই তো চলছে সারা দুনিয়া। কিন্তু আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে জায়গীরদারি প্রথার জোয়াল। আর আজ যখন আমরা আমাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে সংগঠিত হয়েছি, তখন তোমরা বলছ, আমরা তোমাদের জমি তোমাদেরই দান করছি। একেই যদি ভূদান বলে তবে সমস্ত চোর আর ডাকাতকে দাতা বলে অভিনন্দিত করতে হবে। আর তোমরা বড়োজোর আমাদেরই জমির একটা ছোটো অংশই দান হিসাবে দিতে পার। খুব অল্প দিনের জন্যেই, এ জমি আমাদের হাতে থাকবে। কারণ মহাজনী ব্যবস্থায় জমি বেশিদিন কৃষকদের হাতে থাকতে পারে না। ঋণগ্রস্ত কৃষকদের হাত থেকে সে জমি আবার ধীরে ধীরে মহাজন আর জমিদারদের হাতে চলে যায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটাই হচ্ছে নিয়ম।

'যব খেত জাগে' —জাগ্রত কৃষকদের কাহিনি। স্থান অন্ধ্রের মাটি। এই কাহিনির অবয়ব সৃষ্টি করতে আমাকে সাহায্য করেছে কৃষক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক ইউনিটের সঙ্গে জড়িত কর্মীরা। এই আন্দোলন সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ আমাকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে, কারণ অবস্থা মোটেই অনুকূল ছিল না। আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্য পেয়েছি তেলেগু ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার এবং কবি ভাস্কর রাও-এর কাছ থেকে। এই উপন্যাসের নায়ক 'রাঘব রাও' —এই নাম আমি অত্যন্ত সচেতন ভাবেই দিয়েছি। সে হচ্ছে গোলাম বা বিট্টি। তাই তার এই নাম হতে পারে না —ভাস্কর রাও আমাকে সেরকমই বলেছিলেন। গোলামদের নাম —রামলু, থ্যায়ল, রঙড় ইত্যাদি রাখা হয়। রাঘব রাও নাম হতে পারে না। কারণ রাঘব রাও নাম হয় রাজপুতদের। রাঘবপতি তো আমাদের শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন।

সেজন্য আমি স্থির করলাম, আমার নতুন নায়কের নাম নতুনই হবে। বদমাশরা কৃষকদের কাছ থেকে যে-ভাবে ভালো ভালো জমি ছিনিয়ে নেয়, ঠিক সে-ভাবে ভালো ভালো নামও তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর আজ যখন কৃষকরা তাদের হারানো জমি আবার ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখন তারা তাদের হারানো নামও কেন ছিনিয়ে নেবে না। সেজন্যে আমার নায়কের নাম রাঘব রায়। কারণ আজ যে গোলাম, সেই একদিন রাজা রামচন্দ্র হবে।

বর্তমানের গর্ভে 'যব খেত জাগে' কাহিনির জন্ম হলেও, তা আগামীকালের কাহিনিও। আমি শুধু এর একটা সামান্য অংশই দেখেছি। আরও অনেক— অনেক কিছু দেখে লেখার ইচ্ছে আছে।

অনুবাদ : কমলেশ সেন

এবং জলার্ক বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩ ও ৪, ২০০১